The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 17, No. 33-34, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098, e-ISSN 2408-851X
DOI : http://dx.doi.org/10.70438/dujl/173334/0013

বাংলা ভাষা পরিকল্পনা: মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের গবেষণা পদ্ধতির পর্যালোচনা

মোহাম্মদ ইনজামাম[*]

Abstract: This paper evaluates the scientific merit of Muhammad Abdul Hai's contribution in the domain of Bangla language-planning. Hai received his training in structural linguistics in the School of Oriental and African Studies (SOAS) of London University and returned to the then Pakistan with state-of-the-art knowledge. He attempted to address the ongoing issues on reforming the Bangla language in the then East Pakistan and clearly represented his solution by incorporating pure linguistic apparatus. In this article, we try to show that Hai's thought in the language-planning domain illustrates his observation-centered methodology. His work on language planning also manifests an unbiased figure of himself who tries to remain unheated by the political waves regulating in the then Pakistan. Hai is one of the few examples for future linguists in maintaining uncorrupted scientific position in desperate times.

Keywords: Language Planning, Linguistic Identity, Language Reform, Muhammad Abdul Hai, Script and Orthography

১. গবেষণার পটভূমি

মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলাদেশে আধুনিক বা বিশ-শতকী ভাষাবিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তিনি লন্ডন স্কুলের ধ্বনিবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন; এটি এমন সময়ের কথা, যখন লন্ডন স্কুলের ধ্বনিবিজ্ঞান চর্চারীতি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। আবদুল হাই লন্ডনে গ্রহণ করেছিলেন সমকালীন ভাষাবিজ্ঞানের হালনাগাদ প্রশিক্ষণ। ভাষার সাংগঠনিক অস্তিত্ব ও সামাজিক ব্যবহারের পারস্পারিক নির্ভরশীলতার ব্যাপারে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। আমরা জানি, মানবভাষার একটি প্রাণিক মাত্রা রয়েছে, এবং নির্দিষ্ট জনপদে সামাজিক সম্পদ হিসেবেও ভাষার একটি অবস্থান আছে। অর্থাৎ, কথা শোনা ও বলতে শেখার বিষয়টি যেমন একদিকে শারীরবিদ্যার সাথে জড়িত, তেমনি ভাষার সামাজিক রূপ নির্ধারণ করে দেয় যে কথা শোনা ও বলতে শেখার গুণগত প্রক্রিয়াটি কেমন হবে। আবদুল হাই ভাষার অস্তিত্বের এ দ্বৈত কার্যকারিতার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলা ভাষা সংস্কারের যে রাজনৈতিক

---

[*] লেকচারার, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্যোগ, সেটির মূল্যমান বিচারে তিনি স্বপ্রণোদিতভাবেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পেতে হলে অন্তত পাঁচটি রচনা বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়বে।। রচনাগুলো সবই হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলীতে সংকলিত। রচনা পাঁচটির নাম ও উৎস নিচে নির্দেশিত:

প্রবন্ধের নাম	গ্রন্থনাম	রচনাবলী
১. বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	১ম
২. আমাদের ভাষা ও সাহিত্য	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	১ম
৩. আমাদের সাহিত্যের ভাষা	ভাষা ও সাহিত্য	৩য়
৪. পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ভাষার অনুশীলন	ভাষা ও সাহিত্য	৩য়
৫. রোমান হরফ বনাম বাংলা হরফ	ভাষা ও সাহিত্য	৩য়

সারণি ১: হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা কর্মসমূহ

আমাদের এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাষা-পরিকল্পনা শাস্ত্রে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের গবেষণা পদ্ধতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, যেন হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা তৎপরতার নিখাদ একাডেমিক গুরুত্ব নিরূপণ করা যায়। মূলত নির্দিষ্ট জনপদের ওপর ভিত্তি করে গঠিত রাষ্ট্রে ভাষার ব্যবহার ও গঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলোই ভাষা-পরিকল্পনা শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে কোনো মাধ্যমে বা ক্ষেত্রে কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ ভাষা নির্বাচনের বিষয়টি ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, ভাষার গঠনের মানোন্নয়ন যেমন অভিধান তৈরি, ব্যাকরণ রচনা, বর্ণমালা তৈরি ও সংস্কার, বানানরীতি তৈরি ও সংস্কার, পরিভাষা তৈরি ইত্যাদি ভাষার অবয়ব পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত। আমরা দেখব যে, খাঁটি আচরণবাদী ঘরানার এই ভাষাবিজ্ঞানী তাঁর ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা ও সিদ্ধান্তে নিটোল, নির্মোহ ভাষাবৈজ্ঞানিক মেধার পরিচয় দিয়েছেন। আবদুল হাইয়ের গবেষণাকর্ম বিশ্লেষণ করে আমরা দেখাবো যে হাই ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় কী বাস্তবভাবে ব্যবচ্ছেদপ্রিয়। তিনি যখন ভাষাবস্তু ও ভাষা-সমাজ সংক্রান্ত সমস্যার ব্যবচ্ছেদ করেন তখন তিনি দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ রাখেন কেবল তাঁর সমস্যার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনের ওপর। ভাষা-সমাজ সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর উৎপত্তি সাধারণত ক্ষমতার গঠন ও তার চর্চাকেন্দ্রিক। আমরা দেখব যে, হাই মোটেই ক্ষমতার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতা সম্বন্ধে উদাসীন নন, তবু তাঁর পর্যবেক্ষণ প্রণালি সচেতনভাবেই ভাষাবৈজ্ঞানিক। হাইয়ের ভাষাবৈজ্ঞানিক সত্তার মেধাবী বিশ্লেষণ পাওয়া যায় আজাদ (১৯৯৪) এবং আজমে (২০১৮)। তবে, হাইয়ের সামগ্রিক কর্মজীবনই

তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্র এবং তাঁদের আগ্রহ মূলত হাইয়ের ভাষাবৈজ্ঞানিক উদ্যোগের রাজনৈতিক চারিত্র বিশ্লেষণে। অন্যদিকে, আমাদের গবেষণাক্ষেত্র কেবল হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলোতে সীমিত থাকবে এবং আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য হাইয়ের বাস্তববাদী সাংগঠনিক গবেষণাপদ্ধতির ভাষ্যনির্মাণ। আমরা দেখাতে চাই যে, হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত তৎপরতা সচেতনভাবেই রাজনৈতিক উত্তাপবর্জিত, ভাষাবৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতাই বরং সেখানে মুখ্য, গবেষণাপদ্ধতির বস্তুনিষ্ঠতাই সেখানে স্বাভাবিক।

২. মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের বাংলা ভাষা-পরিকল্পনা ভাবনার পরিচয়

গোড়াতেই ভাষা-পরিকল্পনা শাস্ত্রের সাথে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সম্পর্কের একটা বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন। মুহম্মদ আবদুল হাই যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমস্যা সম্পর্কে লিখছেন, তখন ভাষা-পরিকল্পনা শাস্ত্রটি খুব চর্চিত কোনো বিষয় ছিল না। ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষানীতির অধ্যয়ন কাঠামোবদ্ধ বিদ্যায়তনিক চেহারা পেয়েছে আরো অনেক পরে। ফলে ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত পরিভাষাগুলোর ধারণা তখন যে খুব জনপ্রিয় ছিল বা পরিচিত ছিল এমন বলা যায় না। তাই আবদুল হাই তৎকালীন ভাষা সমস্যার আন্তর্গঠন কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, সেটা জানার আগে শনাক্ত করা দরকার ঐ সময়ের ভাষা সমস্যাকে হাই কীভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। হাই গোটা ভাষা সংক্রান্ত সমস্যাটি আমাদের 'নিজেদের' সমস্যা বলে মনে করতেন। বাংলা ভাষার চেহারা কেমন হওয়া উচিত- এ নিয়ে যে বিতর্কে মেতে উঠেছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত নাগরিক সমাজ সেটির উৎস যে রাজনৈতিক তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সমস্যাটির রাজনৈতিক চারিত্রের চেয়ে এর ভাষাতাত্ত্বিক চারিত্রকে হাই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর লেখায় মনে হয়।

"পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এ সমস্যার উদ্ভব নয়, মুসলিম বাংলার এ প্রায় সুদীর্ঘ সাতশ বছরের সমস্যা; বর্তমান রাজনৈতিক তাগিদে নতুন করে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে।" (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৮৮)

হাইয়ের লেখায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে যে বাংলা সাহিত্যের ভাষা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে সংশয় ও দ্বিধা বাংলার মুসলমানদের সাতশ বছরের পুরোনো রোগ; সমস্যাটি মূলে ভাষাতাত্ত্বিক। একই সাথে হাই চিহ্নিত করছেন যে সমস্যাটি 'বর্তমান রাজনৈতিক তাগিদে' নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ যে '৪৭ পরবর্তী বাংলা ভাষা সমস্যার রাজনৈতিক চারিত্র হাইয়ের অজানা নয়, হাই তাকে অস্বীকার করতে চান না, পাশ কাটিয়েও যেতে চান না। তবে এ সমস্যার সমাধান মূলত ভাষাতাত্ত্বিক বলেই তিনি মনে করেন। কারণ-

"আজকের পাকিস্তান ও তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান আর মধ্যযুগের মুসলমান আমলের সারা ভারতবর্ষের বাদশাহী আর সেই পটভূমিতে অখণ্ড বাংলাদেশ। সেদিনও বাঙালী মুসলমানের সামনে সমস্যা ছিল- তার ভাষাই বা কি আর কোন ভাষাতেই বা সে সাহিত্য রচনা করবে!" (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৮৯)

কোনো জাতির ভাষা কী আছে কী হবে কী হওয়া উচিত এবং ঐ জাতির সাহিত্যের ভাষা কী হওয়া উচিত এমন বিতর্কের উৎস হতে পারে বহুমাত্রিক, এমন সমস্যার বুননে ক্ষমতা ও ধর্মের উপাদান থাকতে পারে; তবে সমস্যাটির কাঠামো ভাষাতাত্ত্বিক আর সমাধানও ভাষাতাত্ত্বিক; হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা ভাবনার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। হাই যে সমস্যাটির বয়স চিহ্নিত করেছেন প্রায় সাতশ বছর, সে সমস্যা সাতশ বছর ধরে নানা কারণ কেন্দ্র করে ফিরে ফিরে জমাট বেঁধেছে; এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সেই বাস্তবতা এখন আর নেই, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ৫৩ বছর। তবে তাতেই যে সমস্যাটির মৃত্যু হয়েছে তা কি নিশ্চিতভাবে দাবি করা চলে? নানা আঙ্গিকে সমস্যাটি এখনো প্রবহমান। সমস্যাটির এই যে দীর্ঘজীবন সেটিই হাইয়ের ভাবনার গুরুত্ব নিশ্চিত করে। কারণ রাজনৈতিক বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়েছে বারবার, তবে ভাষাতাত্ত্বিক এ সমস্যা সময়ের আবর্তনে নিজেকে ঠিকই বিবর্তিত করে নিয়েছে। সুতরাং, এর সমাধান মূলত ভাষাতাত্ত্বিক; ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনাই এটির চূড়ান্ত সমাধান এনে দিতে পারে এবং সে সমাধানের দায়িত্ব আমাদের। হাই লিখেছেন-

“এ দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সমস্যা নেই। সমস্যা যা তা আমাদেরই।” (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯৫)

একই প্রবন্ধে হাই লিখেছেন-

“এখনও যদি আমরা এ অনাবশ্যক কলককোন্দল বন্ধ করে আমাদের আপন সাহিত্য সৃষ্টিতে মন না দিই, তাহলে আমাদেরই ভবিষ্যত বংশধরেরা কি ঠিক একালের উর্দু বাংলার ঝগড়ার ও তজ্জনিত সৃষ্ট বিফলতার কথা স্মরণ করে আমাদের দিক থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না?” (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯০)

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত ভাষ্য টেনে এনে এমন সিদ্ধান্ত নেয়াও ভুল হবে যে তৎকালীন ভাষা সমস্যার পেছনে থাকা পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি ও ক্ষমতার চর্চা সম্বন্ধে তিনি অবগত নন। তিনি লিখেছেন-

“পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক তার ভাষায় কি ব্যবহার করবেন বা করবেন না তার নির্দেশ দেওয়া যেমন কোনো রাজনৈতিকের কর্ম নয় তেমনি কোনো ভাষাতাত্ত্বিকেরও তা আওতাবহির্ভূত।” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ২৫)

আমরা সামনে আরো দেখব যে কীভাবে সমস্যাটির রাজনৈতিক অভিক্ষেপ তিনি মোকাবিলা করছেন, তবে এও সত্য যে তাঁর ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত লেখায় সমস্যাটির রাজনৈতিক বহুমাত্রিকতার ব্যাপারটি বেশ অনুচ্চারিত। সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে তিনি পালন করতে চেয়েছেন বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব। সমস্যা ভাষা নিয়েই, তিনি সমাধান প্রস্তাব করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক ঘরানার। তাঁর প্রস্তাবিত সমাধানের যদি কোনো রাজনৈতিক প্রয়োগ থাকে, তবে সে কাজ রাজনৈতিক কর্মীর।

৩. বাংলা ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনায় হাইয়ের সিদ্ধান্ত

হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা সম্পর্কিত যে প্রবন্ধগুলো আমরা পাই, তাতে তৎকালীন ভাষা

সমস্যার ব্যাপারে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রে যে আলোচনা জমাট বেঁধেছিল, তা মূলত আমাদের সাহিত্যের ভাষা কী হবে সেটি নিয়ে; অন্তত হাইয়ের দৃষ্টিতে সমস্যার মূলরূপ তাই-ই। সমস্যা ছিল খোদ বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই, আলাপ ছিল যে বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলা হতে পারে কি না এমনও। সমস্যাটির এসব দিক নিয়েও হাইয়ের বিশ্লেষণ রয়েছে, তবে তাঁর বিশ্লেষণের বড় অংশই আমাদের সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কিত। হাই লিখেছেন-

"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এ ক'বছর ধরে আমাদের সাহিত্যিক, শিক্ষক ও সাংবাদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের সাহিত্যের ভাষা কী হবে সে সম্পর্কে প্রবল আত্মজিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছে দেখতে পাই।" (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ১৫)

'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে এভাবে-

"বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাংলা হওয়া উচিত কি না এবং হলে তাঁর রূপ কি হবে? আরবী পারসী মেশানো, সংস্কৃত প্রভাবান্বিত না এ কালের পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু বাংলা মেশানো খিচুড়ি ভাষা? আর তার সাহিত্যই বা কি হবে? ইসলামী? না পশ্চিমবাংলা ঘেষা? না বাংলা 'মাটিতে বাঙালী-ইসলামী, না অন্য কিছু? এ নিয়ে পাকিস্তান হবার পর থেকেই তর্ক চলে আসছে। এ তর্ককে কেন্দ্র করে সাহিত্যকদের মধ্যে যেমন কাদা ছোঁড়াছুড়ি হয়েছে তেমন পানিও কম ঘোলা হয় নি।" (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৮৮)

হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা আলোচনার বড় অংশজুড়েই রয়েছে বাঙালীর সাহিত্যের ভাষা কী হবে সে আলাপ। আমরা প্রথমেই ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনার অংশে আলোকপাত করতে চাই। পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন কলকাতা নগর কেন্দ্র করে বাংলা ভাষার একটা প্রমিত রূপ শক্তভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কলকাতাকেন্দ্রিক বিপুল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলা ভাষার একটা প্রমিত রূপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল কলকাতাকে ভিত্তি করেই। বাংলার যে উপভাষাটি প্রমিত ভাষার মর্যাদা পেয়ে যায়, সেটি মূলে নদীয়াকেন্দ্রিক। ভারতভাগের আগেই বহু বিদগ্ধজনের লেখায় ঐ উপভাষাটিই ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে করে ঐ উপভাষাটির প্রায়োগিক ক্ষেত্রের কলেবর হয়ে পড়ে বিরাট। পাকিস্তান হবার আগেই তাই নদীয়াকেন্দ্রিক বাংলার সে উপভাষাটির 'ফাংশনালিটি' বা কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত মর্যাদা লাভ করে। ফলে এটি তখনো এবং এখনো প্রমিত বাংলার মর্যাদায় আসীন। তবে ঢাকাকেন্দ্রিক জীবন এবং কলকাতার জীবন স্বভাবতই ভিন্ন। ফলে, এতদিনে এই প্রমিত রূপটির ঢাকাকেন্দ্রিক কিছু স্বাতন্ত্র্য যে তৈরি হয়নি তা নয়, তবে মূল কাঠামো কলকাতাভিত্তিক সেই নদীয়ার উপভাষারই। এ বাস্তবতাকে হাই সংকোচহীনভাবে অনুমোদন করেছেন।

"বুদ্ধিজীবীদের জীবিকা অর্জনের ও সাহিত্যের বাহন হিসেবে এ উপভাষা হিন্দু-মুসলিম সকল সাহিত্যিকের দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। এর মূল গঙ্গাপারে হলেও বিগত দেড়শো বছরে শুধু গঙ্গাপারেই এ গ্রথিত থাকেনি, শাখা পল্লব বিস্তার করে উভয় বাংলারই সাধারণ সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছে। পাকিস্তানোত্তর যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের অধিকারও এর ওপর সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ৪১-৪২)

“সাধারণ সম্পদ” শব্দবন্ধটি এখানে বেশ গুরুত্ব বহন করে। রাজনৈতিক বাঙালিদের বসবাসের জায়গা ভাগ হয়ে গেছে, সেই ভাগের পেছনে কাজ করেছে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, কিন্তু শুধুমাত্র সেই রেখার অন্যপাশে ব্যবহৃত হয় বলেই ঐ বাংলাকে বর্জন করতে হবে এবং ঐ বাংলা ভাষা বর্জন করাই হবে স্বাতন্ত্র্য - বিষয়টি কোনোভাবেই তা নয়। অখন্ড ভারতে যে বাংলা তৈরি হয়ে ছিল, যে বাংলা প্রমিত মর্যাদা পেয়ে গেল, তা হিন্দু মুসলমান বাঙালির অবদানে সমৃদ্ধ। ঐ ভাষাটা আমাদের এবং তাদের। এ বাস্তবতা থেকে হাই দূরে যেতে চান না এবং পাঠককে শক্তভাবে তা স্মরণ করিয়ে দিতে চান-

“আবেগ ও অভিমানবশত এ সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি; কিন্তু কার্যত আমরা কী দেখি? আমাদের বিগত বার বছরের সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভাষা নজীর বিশ্লেষণ করলে আমাদের সব অভিমান এবং আবেগের অসারতা ধরা পড়বে না কি?” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ৪২)

এক্ষণে একটু পুরোনো কথায় ফিরে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সচেতন পাঠক মাত্রই খেয়াল করবেন ‘আবেগ’ ও ‘অভিমান’ শব্দ দুটি সমস্যার রাজনৈতিক চারিত্র তুলে ধরে, সমস্যার জাতীয়তাবাদী বাস্তবতার দিকে আলোকপাত করে। যেমন আমরা দাবি করেছিলাম হাই সমস্যাটির রাজনৈতিক উৎস সম্বন্ধে উদাসীন নন। তিনি জানেন, মানেন এবং উল্লেখও করেন সমস্যাটির রাজনৈতিক মাত্রা। তবে সমস্যার সমাধানে তিনি পালন করতে চান পেশাদার নির্মোহ ভাষাতাত্ত্বিকের ভূমিকা। তবে তার কতটা বিজ্ঞানসাধনার নিমিত্তে আর কতটা সংকটময় রাজনৈতিক বাস্তবতাজনিত সেটি সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা শুধু দুরূহই নয়, তা হাইয়ের প্রতি অন্যায্যতাও বটে। কারণ, স্বাধীন বাংলাদেশে এ সম্পর্কিত কোনো আলাপ-আমাদেরই দুর্ভাগ্য-হাই করে যাবার সুযোগ পাননি এবং এখনো যদি আমরা হাইয়ের তৎপরতার ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলি, তবে সে ব্যাপারে হাইয়ের কী মত সেটা জানার সুযোগ তো আমাদের আর নেই।

হাই উল্লেখ করছেন যে আমাদের সামনে দেড়শো বছর ধরে গড়ে ওঠা ভাষার একটা স্বীকৃত প্রমিত রূপ যদি না থাকত, তবে হয়ত ঢাকাভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এখানকার কোনো এক উপভাষাকে প্রমিত রূপদানের চেষ্টা চালানো যেত। কিন্তু-

“এ অবস্থায় আমাদের সেই মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা গদ্যের রূপায়ণে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বহুকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু লোকের সেই স্ট্যান্ডার্ড ডাইলেকটকেই আমাদের সাহিত্যেরও base তথা মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখি না।” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ৪৫)

হাই এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করছেন যে বাংলা যে প্রমিত রূপটিকে আমাদেরও নিঃসন্দেহে প্রমিত রূপ বলে গ্রহণ করা উচিৎ, কালের বিবর্তনে তার চেহারা থেকে কলকাতাই ছাপ কিছু হলেও মুছে যাবে, মুছে যাওয়া স্থানে বসবে এ অঞ্চলের মানুষের যাপিত জীবনের চিহ্ন। তার এমন প্রকল্পের দূরদর্শিতা ত আজ প্রমাণিত সত্য। হাই লিখেছেন-

“এর ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যে পরিবর্তন এসেছে এবং আসছে তাতে গঙ্গাতীরের স্ট্যাণ্ডার্ড ডাইলেকট আমাদের সাহিত্যের ভিত্তিমূল রচনা করলেও তা যে সম্পূর্ণ অক্ষত ও অপরিবর্তিত থাকবে আমি তা মনে করি না। এখানকার মানুষের জীবন, তার বাচনভঙ্গী, তার স্বপ্ন কল্পনা আশা ও আকাঙ্ক্ষা, তার তাহজীব ও তামদ্দুনের রূপ তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে গেলেই এখানকার উপভাষাগুলোর কোন না কোন বৈশিষ্ট্য, এতকালের অনুশীলিত ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হবেই।” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ৪৫)

হাইয়ের গবেষণা-সংকলন পর্যালোচনা করলেই বাংলাদেশে বাংলা ভাষার উপভাষা নিয়ে তার মৌলিক অবদান চোখে পড়ে। উপভাষাচর্চা হাইসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশেষ করে বাংলা ভাষা সম্পর্কিত তাঁর যে ধ্বনিতাত্ত্বিক গবেষণা সেখানে তিনি বারবারই উপভাষায় পাওয়া ধ্বনিবৈচিত্র্যের অবস্থান ব্যাখ্যার উদ্যোগ নিয়েছেন, কেবল প্রমিত বাংলা ধ্বনিভাণ্ডারকেই গবেষণার আকর হিসেবে নেননি। ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সাহিত্যে উপভাষার স্থান কী হবে কেমন হবে সেটা নিয়ে হাইয়ের অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত, নদীয়ার উপভাষাভিত্তিক বাংলার একটা প্রমিত অবস্থান ঐতিহ্যগতভাবেই আছে বলে এবং এক অঞ্চলের উপভাষা অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে বোধগম্যতার সমস্যা সৃষ্ট করতে পারে বলে বাংলাদেশের উপভাষাগুলোর কোনো একটি কেন্দ্র করে প্রমিত বাংলা গড়ে নেবার উদ্যোগ কোনোভাবেই সফল হবে না। এমন প্রকল্প ভাষাতাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে ব্যর্থ প্রকল্প হতে বাধ্য। তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি সরল ও স্পষ্ট; সাহিত্যে উপভাষার ব্যবহার হবে সাহিত্যের প্রয়োজনে। ভাষার মর্যাদাগত প্রয়োজনে উপভাষা আর কোনো প্রাসঙ্গিক আলোচনাই নয়, কিন্তু সাহিত্যে উপভাষা চলবে কি চলবে না সেটা নির্ধারণ করবে সাহিত্য ও সাহিত্যিক। ধরা যাক, ভোলা অঞ্চলে বাস করে এমন এক মহিষের রাখাল কারো উপন্যাসের মূল চরিত্র এবং সে উপন্যাসের স্থান-কাল-পাত্র সবই ভোলা অঞ্চলটি ঘিরেই। এ উপন্যাসের চরিত্রের মুখে যে কার্যত ভোলার বাংলাই বসতে হবে, সে ব্যাপারে ত সন্দেহের কোন জায়গা নেই। হাই লিখেছেন-

“সাহিত্যের বড়ো উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে অপরের কাছে বোধগম্য করা। এ উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিককেও এমন মিডিয়াম-এর সাহায্যে তা করতে হবে যাতে বহুলোকের কাছে সে নিজেকে বোধগম্য করে তুলতে পারে। সেজন্য উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধে স্থানীয় কোনো ডাইয়েলেক্ট ব্যবহার করলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ৪২)।

এর ঠিক পরেই লিখেছেন-

“উপন্যাস, গল্প ও নাটকের সংলাপে যেখানে চরিত্রগুলোর মূল লক্ষ্য থাকে নিজেকে তাঁর শ্রোতা তথা প্রতিবেশীর কাছে পরিস্ফুট করে তোলা সেখানে অবশ্য প্রয়োজনমতো স্থান বিশেষের উপভাষা চলতে পারে সেখানে উপভাষার সার্থক ব্যবহার চরিত্রগুলোকে সজীব ও জোরদার করে তোলে।” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ৪২)

হাই উল্লেখ করেছেন অমরেন্দ্র ঘোষের ‘চরকাশেম’ উপন্যাসটি, যেখানে বরিশাল জেলার

চর অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের মৌখিক বাংলা এবং তার প্রকাশভঙ্গির সুচারু প্রকাশ ঘটেছে। আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল' উপন্যাসটিও তাঁর প্রিয় উদাহরণ, যে উপন্যাসে ঢাকার গ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র মুসলমানের মুখের ভাষা চিত্রিত হয়ে আছে।

৪. বাংলা ভাষার অবয়ব পরিকল্পনায় হাইয়ের সিদ্ধান্ত

প্রমিত বাংলা কী হবে বা কেমন হবে এবং বাংলার উপভাষাগুলো সাহিত্যে কোন উপায়ে কতটুকু স্থান পাবে এ ব্যাপারে হাইয়ের অবস্থান ছিল স্পষ্ট। তাঁর লেখার দৃঢ় মেজাজ এ ব্যাপারে তাঁর অনমনীয় অবস্থানই প্রকাশ করে। ফলে, স্বভাবতই, ভাষার মর্যাদা পরিকল্পনার অংশে তাঁর লেখার আয়তন সংক্ষিপ্ত। প্রমিত বাংলার ব্যাপারে যেসব সন্দেহ রাজনৈতিক উদ্যোগে তৈরি করা হচ্ছিল, সেসব সন্দেহের ভাষাতাত্ত্বিক দারিদ্র্য নিয়ে হাইয়ের কোনো সন্দেহ নেই বলেই এ অংশে তাঁর ভাষ্যও বেশি দীর্ঘ নয়। বরং হাইয়ের ভাষা পরিকল্পনা সম্পর্কিত লেখাগুলোর বড় অংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে বাংলা ভাষার অবয়ব পরিকল্পনায় এবং এ জায়গাতেই হাইয়ের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ মেলে।

বাংলা ভাষাকে যখন বাদ দিয়ে দেয়া যায়নি, তখন বাংলা ভাষার চেহারা কী করে বদলে ফেলা যায় কী করে এটিকে পাকিস্তানি বানানো যায় সে চেষ্টা সরকারি পর্যায় থেকেই ছিল। বাংলা বাক্য বদলে ফেলা সম্ভব না, বাকবিন্যাসের সাথে শারীরজৈবিক ব্যাপার জড়িত থাকে বলেই বাকবিন্যাস নিয়ন্ত্রণের সরকারি চেষ্টাও খুব একটা কাজে যে আসবে না তা সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। সুতরাং, যা পরিবর্তন করা সম্ভব লক্ষ্য ছিল সেদিকে। তা হল বাংলা ভাষার অভিধান বদলে ফেলা। সাধারণ জনগণকে এ ব্যাপারে সহমত করবার হাতিয়ার ছিল এই যে বাংলা ভাষার ব্যাপক ইসলামিকরণ প্রয়োজন এবং ইসলামিকরণই পারে বাংলাকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে। ফলে, বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে কিছু শব্দকে হিন্দুয়ানি শব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা, সেগুলো বর্জন করা এবং একই সাথে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দের ব্যাপক আমদানি করে বাংলা অভিধান বা লেক্সিকন বদলে দেয়া, এবং বাংলা ধ্বনিতত্ত্বেও বাংলা অক্ষরের গণতন্ত্রের গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়া- এসব উদ্যোগই ছিল পাকিস্তানবাদী রাজনৈতিক কর্মী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মূল হাতিয়ার।

যে কোনো ভাষা-পরিকল্পনা শাস্ত্রের শিক্ষার্থীর জন্য এমন পরিস্থিতির মূল্যায়ন একটি বিপজ্জনক দায়িত্ব। এ বিপজ্জনক দায়িত্বটি হাই পালন করেছেন অত্যন্ত কার্যকরভাবে। এমন দায়িত্ব যে মাত্রায় সংকট বহন করে, তাতে সে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়া যেমন একজন পেশাদার ভাষাবিজ্ঞানীর চৌকস দক্ষতার দিকটি সামনে নিয়ে আসে, তেমনি 'বাংলা'র প্রতি, বাংলা ভাষার প্রতি গবেষকের যে আন্তরিক দায়িত্ববোধ সেটির নিরঙ্কুশ প্রমাণও বহন করে। বিপদ ছিল অনেক রকমের। প্রথম বিপদ এই যে সংস্কার চেষ্টাটা ঘটানো হচ্ছিল ধর্মের নামে। দাবি ছিল যে ধর্মের প্রয়োজনে সংস্কার জরুরি। ধর্ম ও ভাষা দুইই অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় এবং এই দুই নিয়ে রাজনীতি করলে জনগণ খেপিয়ে তোলা কোনো কঠিন কাজ নয়। অমন পরিস্থিতিতে ধর্মের জন্য এ সংস্কার জরুরি নয়, বরং

অপ্রয়োজনীয় আলাপ- এমন অবস্থান গ্রহণ করা দুরূহ কাজ। একই সাথে একাডেমিক আলাপে এ প্রোপাগান্ডা ত ছিলই যে ভাষা সংস্কার একটি বাস্তবতা, পৃথিবীর বহু ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এমনকি ভারতভাগের আগেই বাংলা ভাষার নানামাত্রিক সংস্কার প্রস্তাব ছিল। এ ডিসকোর্স যে তথ্য গোপন করে যেতে চায় তা হল ভাষার প্রয়োজনে ভাষীর প্রয়োজনে ভাষা সংস্কার করা আর রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি থেকে ভাষার সংস্কার করা এক ব্যাপার নয়। এমন ডিসকোর্স এখনো প্রবহমান, তখন তো ছিল শক্তিশালী। এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষার অবয়বের ব্যাপারে পাকিস্তানি পরিকল্পনার দুর্বলতা চিহ্নিত করা বড় রকমের সাহসের কাজ। একথা সত্য যে হাই ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো জাতীয়তাবাদী আলাপের দিকে নিয়ে যান নি। 'ইসলামিকরণ', 'পাকিস্তানবাদ' তাঁর লেখায় হরহামেশাই পাওয়া যাবে না। যা পাওয়া যাবে তা চরিত্রে নিখাদ ভাষাতাত্ত্বিক এবং তাঁর আবেদন এত জোরালো যে পাকিস্তান বাস্তবতার অবসান ঘটলেও ভাষিক বাস্তবতায় হাইয়ের গবেষণার মূল্য অপরিবর্তিত থাকে। সাহসের কাজ সাহসিকতার সাথে চালিয়ে যেতে পেরেছেন সম্ভবত তাঁর আলাপের মূল পাটাতন ভাষাতাত্ত্বিক বলেই।

'৪৭ পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার প্রতি মূল যে অভিযোগ তা হল এর শরীর ও পোশাকে হিন্দুয়ানীর গভীর ছাপ, সুতরাং লেক্সিকনের পরিবর্তন অপরিহার্য। বাংলা সাহিত্যের প্রতি মূল যে অভিযোগ তা হল সাহিত্যের ভাষা, বর্ণনা ইত্যাদি হিন্দুর হাতে তৈরি। সুতরাং, পাকিস্তানের নবতর আলোকে ও পাকিস্তানি দর্শনের চেতনায় বাংলা সাহিত্যকে উদ্দীপ্ত করতে হবে। হাইয়ের গবেষণার মূল কৃতিত্বের জায়গা অন্তত চারটি:

এক, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য যে অবস্থায় যে পর্যায়ে আছে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক বিবরণ হাজির করে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে ঐ বাংলা ভাষা ও ঐ বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলিমের সমান অবদান। তাই হিন্দু-মুসলিম ঐ বাংলা ভাষার সমান উত্তরাধিকার।

দুই, তিনি ভাষা পরিবর্তনে তত্ত্বের সাহায্যে পরিকল্পনাজনিত পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে ভাষায় পরিবর্তন জীবনযাত্রা ও কাল পরিবর্তনের অনুগামী এবং তা বাহিরের নির্দেশে ঘটে না। পরিবর্তন হবে কি হবে না তা নির্ভও করে বাংলাভাষীর মানসে ভাষাতাত্ত্বিক চুক্তির অংশীদারিত্বের ধরনের ওপর। সেখানে জোর জবরদস্তি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তিন, তিনি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন তৎকালীন বিতর্কের পক্ষ-বিপক্ষ। কে পক্ষ, কে বিপক্ষ, কী তাঁদের বৈশিষ্ট্য, কেমন তাঁদের দাবি ইত্যাদি। এ চিহ্নিতকরণের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন ভাষার ওপর ধর্মভিত্তিক পরিকল্পনাজনিত শাসনের অসারতা এবং প্রমাণ করেছেন ভাষা-পরিকল্পনার সবচেয়ে কার্যকর উপাদান হচ্ছে ভাষাবস্তু পরীক্ষাপূর্বক গৃহীত সিদ্ধান্তই।

চার, বাঙালীকে যদি পাকিস্তানের ভাবাদর্শভিত্তিক সাহিত্য রচিত করতে হয়, যদি তাকে

ইসলামি সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয় তবে তার স্বাভাবিক পন্থাটা কী' অন্য কথায় এ ব্যাপারে পরিকল্পনার ধরন আসলে কেমন হওয়া উচিত তিনি তার উপায় নির্দেশ করার উদ্যোগও গ্রহণ করেছেন।

'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে হাই লিখেছেন যে বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্যরচনায় নিবিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ মধ্যযুগ থেকেই আছে এবং এ বাঁধা বাঙালিকে বহিরাগত মুসলমান রাজারা দেয়নি, বাঁধা দিয়েছে বাঙালির নিজের লোকজনই। এমন বাঁধার মুখেও বাঙালি সাতশ বছর ধরে যে সাহিত্য রচনা করে আসছে, তা বাংলা ভাষায়ই রচিত। বাংলার মুসলমান তাঁর সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করেছে বাংলা ভাষাতেই। বাংলা ভাষা সম্পর্কিত নানা কলহকোন্দল তাকে লক্ষ্যচ্যুত করে নি, রাজশক্তিও তাকে লক্ষ্যচ্যুত করার সুযোগ খুঁজে বেড়ায়নি। হাই উলে-খ করেছেন পুঁথি সাহিত্যের ভাষার কথা এবং উল্লেখ করেছেন মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য যেমন হিন্দুর সাহিত্য পিপাসা মিটিয়েছে, তার বিপরীতে মুসলমানের সাহিত্যসুধা হিসেবে হাজির হয়েছিল এই পুঁথি সাহিত্য। হাই লিখেছেন-

"সেকালের বাঙালী মুসলমান সৃষ্টি প্রতিভায় বাঙালী হিন্দুর তুলনায় কম কিছু ছিল না; পুঁথি সাহিত্যই তার প্রমাণ।" (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯০)

পরিকল্পনাশাস্ত্রে এমন তুলনার বহুমাত্রিক গুরুত্ব আছে। এর একটা দিক এই যে হাই নির্দেশ করছেন বাংলা ভাষাকে হিন্দুর একার অবদানে পুষ্ট ভাবাটা ভুল, মধ্যযুগে মুসলমানের অবদান কম বলার সুযোগ নেই। সুতরাং, উত্তরাধিকার প্রশ্নে বাংলা ভাষাটা আসলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের তথা বাঙালীর সম্পদ- এ ব্যাপারে হাইয়ের কখনো কোনো সংকোচ ছিল না। এমন তুলনার দ্বিতীয় গুরুত্ববহ দিক এই যে মনে রাখতে হবে মধ্যযুগে মুসলমানরাই ক্ষমতায়, ফারসি রাজভাষা পর্যন্ত হয়েছিল এখানে। ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত, রাজনীতি, ধর্মপ্রচার ইত্যাদি নানা কারণে আরবি-ফার্সি-তুর্কি শব্দের বিরাট সমাহার বাংলা ভাষায় ঘটে চলছিল। তাতে করে বাংলার হিন্দু বাংলা ভাষাকে পরিত্যাগ করে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয় নি। সে বাংলাকে ত গ্রহণ করেছেই, সাথে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করেছে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাথেয় হিসেবে। হাই উল্লেখ করেছেন যে বাংলায় উপাখ্যান কাব্যরচনা হিন্দুমুসলমানদের ফারসি ভাষা চর্চার সমসূত্রেই এদেশে এসেছে। (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯১)

ভারতচন্দ্র, প্যারিচাঁদ মিত্র এবং বঙ্কিমের রচনার উদাহরণ উল্লেখ করেছেন হাই এবং বলেছেন যে এঁদের রচনায় আরবি ফারসি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯১)

হাই লিখেছেন-

"হিন্দু অবশ্য তাঁর নিজের দৃষ্টি দিয়েই এ যুগের মুসলমানদের জন্যও সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছে। হিন্দু গিরীশচন্দ্র কোরান শরীফ ও হাদিস শরীফের প্রথম অনুবাদক, হযরত মোহাম্মদের প্রথম জীবনী লেখক; মুসলমান সাধকগণের প্রথম জীবনী প্রচারক।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিরাজুদ্দৌলা ও মীরকাসিমের প্রথম কলঙ্কমোচক। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, রামপ্রাণ গুপ্ত ইসলামের ইতিহাস লেখক; সত্যেন দত্ত ও মোহিতলাল বাংলা মুসলিম কৃষ্টির রূপকার ও কবি।” (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯১-৪৯২)

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এ সময়টায় দেখা যায় যে বাঙালি মুসলমান হিন্দুদের সাথে তাল মিলিয়ে সাহিত্য রচনা করেছে এবং সেখানে হিন্দু বাংলা ভাষাকে মুসলমানের বা রাজশক্তির ভাষা বলে বর্জন করে নি। সুতরাং, বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী বললে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখক ও রাজাদের যে বিপুল অংশগ্রহণ সে সত্যকে অস্বীকার করা হয়।

১৭৫৭ সালে যখন রাজশক্তির পরিবর্তন হয়, ব্রিটিশরা বাংলা এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতের ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন থেকে রাজনৈতিক কারণে মুসলমান সম্প্রদায় জাতীয় জীবনে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। মুসলমানদের পরাজিত করে ক্ষমতাগ্রহণ করা হয়েছে বলে ব্রিটিশদের দিক থেকেও মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার কারণ ছিল। ফলে-

“ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত এ যুগ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও সুবর্ণ যুগ। এ যুগের বাংলা সাহিত্য মূলত বাঙালী হিন্দুর সৃষ্টি। তার পাশে মুসলমান রচিত সাহিত্য একটা ক্ষীণ দীপালোকের মতই মিটমিট করছে।” (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯২)

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশ যে হিন্দুরই কৃতিত্ব, সে হিন্দু এ সাহিত্য তৈরি করেছে কোন ভাষায়? মধ্যযুগে মুসলমান আর হিন্দু মিলে যে ভাষা রেখে গেছে, সে ভাষাকে গ্রহণ করেই তো। তাতে মুসলমানের অবদান আছে বলে, আরবি-ফার্সির ব্যাপক ব্যবহার আছে বলে হিন্দু তাকে বর্জন করেনি। যদি তা না করে থাকে তাহলে সাহিত্যে হিন্দুয়ানীর ছাপ আসলো কোত্থেকে? হাই চিহ্নিত করছেন-

“সুতরাং হিন্দুর রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য যে হিন্দু কৃষ্টিরই যে ছাপ বহন করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। হিন্দু কৃষ্টি বাদ দিয়ে যে পরিমাণে তা মানুষের অন্তর্জীবনের গাঁথা রচনা করেছে সে পরিমাণে বাঙ্গালির সুতরাং মুসলমানেরও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য।” (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯২)

মধ্যযুগ থেকে ব্রিটিশ শাসনকাল পার হয়ে পাকিস্তান যখন তৈরি হল, তখন বাংলা ভাষা যে চেহারায় ছিল সেটার উত্তরাধিকার বাংলার হিন্দু-মুসলিমেরই। মুসলিম শাসনামলে তাতে আরবি-ফারসির আমদানি হয়েছে, ব্রিটিশ শাসনামলে তাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ঘটেছে, এসবই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সত্য। একে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার কোনো বাস্তবতা নেই। এসবই ভাষার নিজস্ব পরিবর্তনের গতিপথ ধরে, জোর জবরদস্তি সেখানে চলেনি। যেমন, হাই উল্লেখ করেছেন-

“বিগত দেড় শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা বিশেষ করে তাঁর গদ্যের রূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ থেকে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কি করে সংস্কৃতের ভারমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে নিরাভরণ নগ্ন-সৌন্দর্যে আপনাকে মেলে ধরেছে।”

হাইয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূত্র ধরে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আগমনের একটা ধারা বা পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল বটে তবে আগমনকৃত শব্দগুলোর যেটুকু বাংলার সাথে থাকতে পারে, সেটুক রয়ে গিয়ে বাকিটা খসে গেছে বা ব্যবহারঅযোগ্য হয়ে পড়েছে। ঐ সময়ের সাহিত্য মূলত হিন্দুর সৃষ্টি বলেই যে সে ফোর্ট উইলিয়ম ঘরানার বাংলাকে গ্রহণ করে বসেছিল এমন তো নয়। সুতরাং, এসব কিছু পার হয়ে পাকিস্তান হবার প্রাক্কালে যে বাংলা ছিল, তা বাঙালির; হিন্দুর এবং মুসলমানের। এই ভাষাই হবে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের বাঙালির সাহিত্যের ভাষা।

সমাধান করার জন্য হাইয়ের সামনে সমস্যা ছিল আরো। ঐ ভাষাই যদি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির ভাষা হয়, তবে পাকিস্তান সৃষ্টির যে মূল উদ্যম, যে মূল প্রেরণা সেটাকে সাহিত্যে চিত্রিত করা যাবে কীভাবে। রাজনৈতিক সমাধান ছিল এটা-সেটা বর্জন, তবে হাইয়ের সমাধান ছিল উদ্ভাবন ও সংযোজন। হাই থেকে উদ্ধৃত করি:

“সাহিত্যের সহজ একটা সংজ্ঞা এই যে, সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যিক যে জীবন রচনা করেছেন সে কার জীবন? কোন জীবন? কোন সমাজ? কোন শ্রেণীর জীবন?” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ১৮)

সাহিত্যিক যে জীবনের যে চরিত্রের চিত্র রচনা করে চলেছেন, তাঁর শব্দ নির্বাচিত হবে ঐ জীবন বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দমালা থেকেই। ধরা যাক, সাহিত্যিকের নায়ক যখন হবে পূর্ববঙ্গের কোনো মুসলমান কৃষক, তখন সেই কৃষকের নামাজের অভ্যাস থাকলে তাকে আমরা দেখব সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে, অজু করছে, মসজিদ, জায়নামাজ, আযান, তিলাওয়াত, কোরআন ও তাঁর সূরাসমূহ, হাদিস ইত্যাদি তাঁর জীবনের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। ফলে ঐ চরিত্রের বর্ণনায় সাহিত্যিক ত এসব শব্দ ব্যবহার না করে পারবেন না। সুতরাং, মুসলমানের স্বাধীন আবাসভূমির কল্পনা ও উদ্যমে উদ্দীপ্ত মানুষের সংগ্রামে যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, তার মানুষের জীবনযাপনে যদি সেই ছাপ পড়ে, যদি সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্ম স্থায়ী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়, যদি সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামো ইসলামী ভাব বহন করতে শুরু করে তবে ঐ সমাজ নিয়ে রচিত সাহিত্যে ঐ ঘরানার প্রয়োজনীয় শব্দ স্বচ্ছন্দে চলে আসবে। এজন্য ভাষাকে কোনো নির্দেশ দেবার প্রয়োজন নেই। ভাষায় শব্দ গ্রহণ বর্জন চলে দীর্ঘ সময় ধরে, কোনো কোনো শব্দ বহু চেষ্টার পরেও স্থায়ী হয় না। বাংলা কিছুদিন আগেও এবং এখনো ‘বহুনির্বাচনী অভীক্ষা’ শব্দজোড় প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এই অভীক্ষা শব্দটিকে মানুষের মুখে তোলা যায়নি। অনেক পত্রিকাই মুঠোফোন লেখার উদ্যোগ নিয়েছে, মুঠোফোন শব্দটা এখন অনেকে জানে মাত্র, ব্যবহার ত করে না। যে শহরের কোথাও কফি পানের ব্যবস্থা নেই, সে শহর নিয়ে উপন্যাস লিখলে সেই উপন্যাসের কোনো চরিত্রের কফির দোকানে যেতে ‘ইচ্ছা’ করবে না, কোনো চরিত্রই ‘কফিশপে’ বসে কারো জন্য অপেক্ষা করবে না। তবে-

“এর জন্য জোর জবরদস্তি করলে চলবে না। কেন না ভাষা নানা প্রভাব সহ্য করে কিন্তু জোর জবরদস্তি সহ্য করে না। জোর জুলুম করে অপরিচিত আরবি ফারসি শব্দ ভাষার স্বাভাবিক গতি তাদের যেমন স্বীকার করে না; তেমনি গুরুভার সংস্কৃত শব্দও বাংলা

ভাষার গতিপথে টিকলো না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা বাংলা গদ্যের নির্মাণে জবরদস্তি করেই গুরুভার সংস্কৃত শব্দের আমদানি করেছিলেন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা তার স্বাভাবিক গতিপথে পরিণতি লাভ করেছে। প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথের হাতে এ ভাষা হয়েছে আরও সহজ-সুন্দর।" (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ২১)

'৪৭ পরবর্তী সময়ে বহু বাংলা শব্দ, প্রবাদবাক্য তথা ইডিয়ম বর্জনের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছিল ধর্মের নামের আড়ালে এবং এমন বর্জনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন আমাদেরই সাহিত্যিকদের কেউ কেউ। একই সাথে চলছিল-

"তেমনি আমাদের এখানেও নিত্যব্যবহার্য ও বহুল প্রচলিত সাধারণ বাংলা শব্দের পরিবর্তে 'জমহুরিয়া', 'সদরে রিয়াসাত', 'জসনে আজাদী', 'ঈদ জমিমা', 'আশিয়ানা', 'গোজারেশ' ইত্যাদি অপ্রচলিত এবং সাধারণের অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করার প্রয়াস দেখা গেছে।" (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ২৪)

এ শেষোক্ত উদ্যোগকে আবদুল হাই পরীক্ষা নিরীক্ষার শ্রেণিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেহেতু পাকিস্তান তৈরি হয়েছে, আরবী-ফারসী অপরিচিত শব্দ প্রচলনের দাবিও কিছু আসবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার একটা উগ্র চেহারাও হয়ত দেখা যাবে, তবে এ উদ্যোগকে তিনি স্বাগতই জানান এবং সাথে এও জানিয়ে দেন যে এসব শব্দ ভাষায় আসবে কি না তা কারো নির্দেশে বা জবরদস্তির ওপর নির্ভও করে না। ভাষার নদীতে অযথা বাধ না দিলে, ভাষার গতিপথ স্বাভাবিক থাকতে দিলে ভাষা এবং ভাষীরাই ঠিক করে নেবে কতটুকু আগমন তারা সহজভাবে গ্রহণ করবেন। এ ধরনের শব্দ প্রচলনের উদ্যোগের পিছে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংকুচিত করে দেবার রাজনৈতিক প্রবণতা যে ছিল না তা বলা যায় না, এমন উদ্যোগ হয়ত পাকিস্তানবাদেরই উগ্র বহিঃপ্রকাশ, তবে আমাদের বিবেচ্য বিষয় এই যে আবদুল হাই তার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে আবারও একজন নির্মোহ ভাষাবিজ্ঞানীর পরিচয় দিলেন। কারণ, ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনাতেই নতুন শব্দ চালিয়ে দেবার পরীক্ষা যে করা যাবে না এমন ত নয়। সে পরীক্ষার ফল কী হবে, তার কার্যকারণ ভাষাতত্ত্বের অনুগামীই হবে বটে; তা সে পরীক্ষাকারীর বা পরীক্ষাকারীদের উদ্দেশ্য সৎ বা অসৎ যাই হোক না কেন। অবয়ব পরিকল্পনা শাস্ত্রের অংশ হিসেবেই এই পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলের ব্যাপারে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

প্রবাদবাক্য বর্জনের দাবিটি কৌতুককর। 'বিদ্যার জাহাজ' না হয়ে 'এলেমের জাহাজ', 'দাতা কর্ণ' না হয়ে 'দাতা হাতেম', 'চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই' না হয়ে 'কোরআন পাঠ থেকে টুপি সেলাই'-অর্থাৎ যেসব শব্দে হিন্দুয়ানীর চিহ্ন পাওয়া গেল, সেগুলো সংশোধন করতে হবে। আগে দেখিয়েছি, হাই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, '৪৭ এর প্রাক্কালে যে বাংলা রইল, সেটা বাংলার হিন্দু মুসলিম সবারই বাংলা। আমরা এখন দেখব যে এই প্রবাদবাক্যগুলোর ব্যাপারে হাই তার ভাষাতাত্ত্বিক মেধা কীভাবে প্রয়োগ করেছেন।

হাই বেশ দীর্ঘ আকারেই বর্ণনা করেছেন ভাষা পরিবর্তনের তত্ত্ব। ভাষার বাক্য বা বাকবিন্যাস বা শব্দগ্রন্থনার রীতি বদলে যেতে একাধিক শতাব্দী সময়ও লেগে যেতে পারে। এর থেকে যে পরিবর্তনগুলো একটু দ্রুত হয়, সেগুলো হল ধ্বনিগত কারণে শাব্দ

পরিবর্তন এবং আর্থ পরিবর্তন। মানুষের মুখ নিঃসৃত আওয়াজ বহু অক্ষর বা সিলেবলের পাশাপাশি গ্রন্থনার ফল। অক্ষরপরম্পরা তৈরির কালে মানুষ বাগযন্ত্রের ব্যবহারে আরাম তৈরির পথ খোঁজে এবং ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে শব্দের আকারগত পরিবর্তন ঘটায়। তার থেকে যে পরিবর্তন জটিল তা হল শব্দের আর্থ পরিবর্তন। যেমন, হাই দেখিয়েছেন 'মধুর' শব্দটির একসময় আভিধানিক অর্থ ছিল মধু মাখিয়ে দেয়া হয়েছে এমন। মধুর শব্দের এ অর্থটি এখন একেবারে নেই। 'মধুর' শব্দের অর্থ এখন মিষ্টি, চমৎকার, রমণীয় ইত্যাদি। (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ২৬)

এ প্রসঙ্গেই 'লক্ষ্মী' বা 'জন্মজন্মান্তরে'-র ব্যবহার বিবেচনা করা যাক। নতুন পাকিস্তানে এদের ব্যবহার করা ঠিক হত- বলতে গেলে বা লিখতে গেলে? হাই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে এতে সন্দেহ নেই জন্মজন্মান্তর শব্দটি মূলে হিন্দু ধর্মের সাথে যুক্ত। সাইকেলস অব বার্থ এবং রিবার্থের ধারণার সঙ্গে 'জন্মজন্মান্তর' শব্দটি সম্পর্কিত। সে হিসেবে শব্দটিকে প্রকৃত প্রস্তাবেই 'হিন্দুয়ানী' বলে চিহ্নিত করা চলে। তবে, হাই জানাচ্ছেন-

"কিন্তু, কি হিন্দু, কি মুসলমান সে যেই হোক একথা বলতে গিয়ে পুনর্জন্মের কথা ভেবে বলে না। বাংলা ভাষায় এর মুখ্য অর্থ নয়। গৌণ অর্থ অর্থাৎ আমি তোমার আমৃত্যু ভুলবো না এটিই প্রধান হয়ে ওঠে। এ ভাবানুষঙ্গে এ অর্থ ছাড়া বাংলা অন্য অর্থ প্রচলিত নয়। সুতরাং, পূর্বপাকিস্তানী বাংলাভাষী মুসলমানের এ কথাটুকুকে নিজের বলে গ্রহণ করতে আমি দোষ দেখি না।"(হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ২৬)

শব্দ ব্যবহারে বিশেষ ধরনের সতর্কতার কথাও হাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হিন্দু কৃষ্টির সাথে জড়িত শব্দ মুসলমানের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে, যেমন 'নমস্কার' শব্দটি ধরা যাক। মুসলমান এ শব্দটি ব্যবহার করতে না-ই চাইতে পারে, মুসলমানকে ত কেউ বাধ্য করছে না।

মুহম্মদ আবদুল হাই একজন নির্মোহ ভাষাবিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, রচনা করেছিলেন আশ্চর্য মেধাবী অথচ নিরুত্তাপ প্রবন্ধ। ঐ নিরুত্তাপ প্রবন্ধগুলোই বহন করে চলেছে অসামান্য একাডেমিক বিশ্লেষণ। তিনি বাংলা ভাষা সংস্কার উদ্যোগের ব্যাপারে চরমপন্থী ও নরমপন্থী দল চিহ্নিত করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে সংস্কার উদ্যোগের রাজনীতি তার জানার বা বিশ্লেষণের পরিধির বাহিরে নয়। বরং তাঁর একান্ত আগ্রহ মূলত একাডেমিক ভাষ্যরচনার দিকেই।

> "সুতরাং, আমাদের মধ্যে একদল ভাবছেন বাংলা ভাষাকে একেবারে বাদ দিয়ে উর্দুকে বরণ করা যখন সম্ভব হল না, তখন প্রচুর আরবী ফারসী তথা উর্দু শব্দ আমদানি করে, বাংলার বর্ণমালা পর্যন্ত পালটে দিয়ে বাংলাকে ধীরে ধীরে উর্দুর সমপর্যায়ে টেনে তুলতে হবে। এরা হলেন চরমপন্থী। নরমপন্থীরা মনে করেন বড় রকমের রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রতি দেশেরই জাতীয় জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। তাই আমরা যখন পাকিস্তান অর্জনে সফলকাম হয়েছি তখন পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য আস্ফালনের প্রয়োজন নেই, ভাষাকে আজই ঢেলে সাজাবার তাগিদ নেই আর বাংলা বর্ণমালাকে গঙ্গা পার করে পশ্চিম বাংলার 'কুফরস্থানে' ঠেলে দিয়ে হুরুফুল কোরানের ভাওতায়

উর্দু অক্ষর গ্রহণ করারও জরুরাত নেই।" (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৮৮)

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা ভাবনার যে বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে হাইকে নরমপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করাটা ভুল হবে না। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল চরমপন্থী ও নরমপন্থী বর্গদ্বয় রাজনীতি-ঘেঁষা। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত নেয়াই যায় যে হাই যে নিজেকে রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে অবসর দিয়েছেন এমন নয়, বরং নরমপন্থীর চিন্তা কেন যুক্তির বিচারে জয়ী তিনি তারই শাস্ত্রীয় পাঠ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ স্থির বিবরণধর্মী ভাষ্যের সামনে জবরদস্তিমূলক যুক্তি প্রদান করা ছাড়া চরমপন্থীদের আর কোন উপায় ছিল বলে মনে হয় না।

বাঙালির ভাষা কি হবে এই নিয়ে সংশয়ে থাকা বাঙালিদের ভাবনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন এমন সংশয় বর্তমান ছিল মধ্যযুগেও। তাঁর ধারালো বিদ্রুপ লক্ষ্যণীয়-'এক দল বাংলা বর্জন করে কি জানি কোন মুসলমানী ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিল।"(হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৮৯) এবং তখনো এই চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের বিদ্রুপ করতে ছাড়েনি। অন্য অনেক গবেষকের মতই হাইকেও উল্লেখ করতে হয়েছে কবি আবদুল হাকিমের ক্ষমাহীন সতর্ক উক্তি।

বাংলা ভাষার ওপর বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সমান অধিকার। একই সাথে এও সত্য যে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, ফলে জীবন যাপনের রীতিতে পদ্ধতিতে সে পার্থক্যের ছাপ রয়েছেই। সে ছাপ যে সাহিত্যে সময়ের সাথে সাথে চলে আসবে হাইয়ের সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। লিখেছেন-"এর সূক্ষ উদাহরণ পশ্চিমের বাউল সঙ্গীত আর পূর্ব বাংলার ভাটিয়ালী। প্রাণের আবেগ দুটোতেই সমান তবু বাউলে চড়াই, ভাটিয়ালীতে উৎরাই। শুষ্ক ও রুক্ষতার জন্য বাউলে ঊর্ধ্বশ্বাস আর প্রচুর জলীয় বাষ্পের জন্য ভাটিয়ালীতে শ্বাস নিম্নগামী।" সাহিত্যে এ পার্থক্যের প্রতিফলন ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের স্বাভাবিক গতিতেই আসবে। এর জন্য জবরদস্তি নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক। তবে, চরমপন্থীরা শুধু এ প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ নয় যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা কী করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র হবে, বরং প্রশ্ন উঠেছে "সাহিত্যকেও দ্বীন ইসলামের কলেমা পড়াতে হবে।" আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই এ ব্যাপারে আবদুল হাই কী ধরনের সমাধান প্রস্তাব করেছেন।

আবদুল হাইয়ের মতো ভাষাতাত্ত্বিক আবারো বেশ নিরুত্তাপ বৈজ্ঞানিক সমাধানেরই আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাধানে ঐ প্রশ্নের রাজনৈতিক আবহ দ্রবীভুত হতে বাধ্য। তাঁর প্রস্তাবিত সমাধান এমন যে ইসলামী সাহিত্য হল ইসলাম বিষয়ক সাহিত্য এবং বাংলাসহ যে কোনো ভাষায় ইসলাম বিষয়ক সাহিত্য রচিত হতে পারে, হয়ে আসছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান যদি চায় এটি ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করবে তবে সে সৃষ্টির দায়ভার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যিক উদ্যোগই সমাধান, ভাষাশাসনের কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামী সাহিত্য রচনার উপযোগী শব্দ বা পরিভাষা পাওয়া না গেলে লেখক তা তৈরি করে নেবেন। তৈরিকৃত নতুন শব্দ বা পরিভাষা টিকে যাবে কি না সে বিচার ত সময়ের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। হাই এ প্রসঙ্গে এটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে কোনো সাহিত্য মুসলমান রচিত হলেই

ত আর ইসলামী সাহিত্য হয়ে যায় না।

“পূর্ববঙ্গের সাড়ে তিনকোটি মুসলমানের সাহিত্য আমাদেরই রচনা করতে হবে। কোরান, হাদীস, ফেকা উসুল, শরাহ শরীয়ত মাফিক মুসলিম জীবন যেভাবে নিয়ন্ত্রিত তার সাহিত্যকেও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্মে উজ্জীবিত হতে হবে।” (হাই, ১৯৯৪/১, পৃ. ৪৯৪)

৫. বাংলা বর্ণ ও লিপির ব্যাপারে হাইয়ের সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা

ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ে হাই-প্রতিভার আন্তরিক নিদর্শন মেলে তাঁর ‘ রোমান বনাম বাংলা হরফ’ প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটির গবেষণা পদ্ধতিও ভাষা-পরিকল্পনা শাস্ত্রে ব্যবহারের জন্য নিখুঁত নিদর্শন। বাংলা বর্ণমালা বাদ দিয়ে রোমান হরফে বাংলা লেখার যে একটা ধুয়া উঠেছিল তাঁর বিশ্লেষণে হাই প্রথমেই রোমানপন্থীদের সকল যুক্তির একটি তালিকা তৈরি করেছেন। এরপর একে একে তালিকায় জমা হওয়া নয়টি যুক্তি খারিজ করে দিয়েছে প্রতিযুক্তির সাহায্যে। যুক্তিগুলোর ক্রমটি লক্ষ্য করার মত। একেবারে অন্তঃসারশূন্য দাবি থেকে শুরু করে দারুণ বিতর্ক করা যায় এমন সকল যুক্তিই তিনি তাঁর তালিকায় স্থান দিয়েছেন।

প্রথমেই বলেছেন বাংলা ভাষা যে কোনো লিপি দিয়েই লেখা সম্ভব কিন্তু যেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত বাংলা লিপি আছে এবং তাতে প্রচুর টেক্সট ছাপাও হয়েছে, সেখানে লিপি পরিবর্তনে ত কোনো আলাদা লাভ নেই। রোমান হরফ বাংলা লিপির চেয়ে বেশি বিজ্ঞাসম্মত এমন যুক্তির জবাবে বলেছেন লিপি ও বানানের রীতি আর ভৌতবিজ্ঞান এক বিষয় না। লিপি ও বানানের রীতি প্রত্যেক ভাষায় কম বেশি বৈসাদৃশ্য অনুমোদন করে। লিপি ও বানান বরং শেখা ও চর্চার বিষয়। আর একই লিপি চালু করলে পাকিস্তানের দুই অংশে ব্যবধান কমে আসবে এমন কথার কোনো যুক্তি নেই। কারণ বাংলা ও উর্দুর ধ্বনিতত্ত্ব ভিন্ন। একই রোমান লিপিতে লিখলেও লিপির ব্যবহার দুই ভাষার ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম হতে বাধ্য। দৃঢ়ভাবেই বলছেন যে পাকিস্তানিদের এক জাতি করে গড়ে তুলতে হলে পাকিস্তানের দংই অংশে যোগাযোগ বাড়াতে হবে, ন্যায় ও সমতার শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভাষার ঐক্য বা লিপির ঐক্য জাতি গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয় না। যদিও ভাষার ঐক্য জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান, বাংলা আর উর্দু ত আলাদা ভাষা। লিপি যদি রোমান করেও নিই, ভাষা ত দংটোই থেকে গেল। আবার, পৃথিবীর অনেক ভাষাই রোমান হরফে লেখা হয় সত্য, তবে এটি কোনো যুক্তি না যে সেজন্য সকল ভাষা রোমান লিপিতে লেখা উচিত। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি:

“তুরস্কের রোমান হরফ গ্রহণের যে প্রেরণা তা বিজ্ঞানের না জাতীয়তাবাদের? ভাষাতাত্ত্বিক না রাজনৈতিক?” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ.৬৯)

তুরস্কের জনগণের রোমান হরফ গ্রহণের বিষয়টি জাতীয়তাবাদভিত্তিক। এখানে বিজ্ঞানের আলাপ তুলে লাভ নেই। এ লেখা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভাষা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী ভাবনাসমূহের ঘাত-প্রতিঘাত চলছিল, সে

ব্যাপারে হাই পূর্ণ অবগত। হয় তিনি নিছক নিখাদ ভাষাবিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন অথবা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল মনে করেন নি বিধায় তাঁর আলাপে জাতীয়তাবাদী ঝোঁক টেনে আনতে চান নি। তবে তাঁর ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ক যেসব একাডেমিক থিসিস সেগুলো বহির্জগতে জাতীয়তাবাদী লড়াইয়ের একটা কার্যকর পাটাতন ত বটেই। হয়ত তিনি নিজে সে পাটাতনের সক্রিয় যোদ্ধা নন। তবে, আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যেত যদি স্বাধীন বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত আমরা জানতে পারতাম। সুতরাং, আমরাও যদি গবেষণায় তাঁরই মত নির্মোহ হতে চাই, তবে শুধু তাঁর ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ক একাডেমিক নৈপুণ্য বিশ্লেষণ করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ভারতবর্ষের সব ভাষাই কিছুদিনের মধ্যে রোমান হরফ গ্রহণ করবে, এমন অনিশ্চিত তথ্য আমলে নিয়ে আগেই আমাদের রোমান লিপি গ্রহণের কোনো যুক্তি নেই, এবং ভারতের সকল ভাষা রোমান লিপি গ্রহণ করলেও বাংলাকে করতে হবে এমন কথা নেই। বাংলা লিপির বদলে রোমান লিপি চালু করলে শিক্ষার হার বেড়ে যাবে এমন যুক্তিকে আক্রমণ করেছেন হাই। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার বিস্তারের জন্য শিক্ষায়তনিক উদ্যোগটা জরুরি, লিপি পরিবর্তনের সাথে বিষয় সম্পর্কিত নয়। বাংলা ত অন্তত সংকটাপন্ন ভাষা নয়। একই সাথে যদি টাইপ রাইটারে বাংলা হরফ ব্যবহারের নানা সমস্যা দূর করতে চাই, তবে যন্ত্রের দিকে নজর দিতে হবে, লিপি সংস্কারের দিকে নয়। যেহেতু বাংলা ভাষা লেখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত লিপি আছে, যেখানে সে লিপিতে এর মধ্যেই প্রচুর বই ও পত্রিকা ছাপা হয়েছে, যেহেতু লিপিটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ, যেহেতু পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রসারে লিপির গুরুত্ব প্রায় শূন্য এবং যেহেতু টাইপ রাইটার জনিত সংকট প্রায় সব লিপির জন্য একটি বাস্তবতা, সে বাস্তবতায় হাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন এভাবে-

“বাংলায় রোমান লিপির প্রচলন করলে যতটুকু না সুবিধা সৃষ্টি করবে তার চেয়ে অসুবিধার সৃষ্ট করবে অনেকগুণ বেশি। সুতরাং রোমান লিপির প্রচলন করে সমগ্র জাতি যে অসুবিধায় পড়বে, তার তুলনায় বর্তমান বাংলা লিপির সামান্য দোষ-ত্রুটির কিছু সংস্কার করে নেওয়া বহুগুণে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ.৭১)

ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজগুলোর মধ্যে আবদুল হাইয়ের মূল দৃষ্টি ছিল আমাদের সাহিত্যের ভাষা কী হবে এবং বাংলা লিপি ও বানানের রীতি কী হবে তার ওপর। বাংলা লিপির ব্যাপারে হাই নিশ্চিত মত প্রকাশ করেছেন যে রোমান বা আরবি-উর্দু বা অন্য কোনো বর্ণমালা দিয়ে বাংলা বর্ণমালা প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব নয়। তবে বাংলা লিপির অভ্যন্তরীণ দোষ-গুণের বিষয় হাইয়ের নিজস্ব পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এ ব্যাপারের হাই মূল আলোচনা উপস্থাপন করেছেন তাঁর ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ গ্রন্থের ‘বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা’ অধ্যায়ে।

এ রচনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব যে লিপি ও বানান সমস্যার ক্ষেত্রে হাই যেমন নিজস্ব মৌলিক গবেষণা পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছেন, বানানের গণতান্ত্রিকতা যেমন আমলে নিয়েছেন, তেমনি কোনো কোনো বর্ণ বা কোনো নির্দিষ্ট ধরনের বানানের ক্ষেত্রে তাঁর

উপস্থাপিত সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা যেতে পারে। এ অধ্যায়ে হাই বলতে চান যে বাংলা বর্ণমালা প্রণয়নকালে বা বানানরীতি তৈরি ও প্রণয়নকালে বাংলা ভাষার যথার্থ ধ্বনিবৈজ্ঞানিক ভাষ্য রচিত হয়নি। হাইয়ের এ দাবি এখনো পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় গবেষণা হাইয়ের আগেপরে কেউ এত আন্তরিক দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেননি। এখানে উল্লেখ্য, হাই মনে করছেন কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের সম্যক বিবরণ সে ভাষার বর্ণমালা প্রণয়ন ও বানান সংস্কারে রীতিমতো বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা যেমন স্বীকার করতে হবে যে লিপি ও বানান সম্পর্কিত তাঁর সংস্কার উদ্যোগ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ নয়, যেমন নয় তাঁর অন্যান্য ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোও; অন্যদিকে এটাও স্বীকার করতে হবে ধ্বনিতত্ত্বের প্যাটার্নের সাথে বানানের সরাসরি অনুগামিতা দাবি করাও সম্ভবত ভাষা-পরিকল্পনা শাস্ত্রের পরিপন্থী। কারণ, ধ্বনি ও অক্ষরবিন্যাস নির্দিষ্ট সূত্রশাসিত হয়ে থাকে, বানানের ক্ষেত্রে সূত্রের সামঞ্জস্য বজায় রেখে সূত্রমালা প্রতিপাদন একটা দুরূহ ব্যাপার। যেমন, ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে ‘bear’ হল বিয়ার বা বেয়ার, কিন্তু ‘heard’ হল হার্ড, হিয়ার্ড নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করা মুশকিল। এটুকু মেনে নেয়াই শ্রেয় বানান তৈরির সাথে চোখের দেখার প্রজ্ঞানমূলক সম্পর্ক কিছু একটা আছেই, এবং একবার এরকম কোনো বানান জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রচলিত হয়ে পড়লে ঐ বানান থেকে সরে আসা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বানানের সাথে জড়িত থাকে প্রচল-অচল সম্পর্ক, বানানের সাথে জড়িত থাকে কোমল আবেগ। ঐতিহ্যও বানানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন, বিধি অনুযায়ী বাংলা ‘ঈদ’ বানান ‘ইদ’ হওয়া উচিত, তবু দেখা যায় বাঙালিরা ইদ বানান প্রচলনে বাধা দিয়েছে। এর কারন সূত্রশাসিত নয়। বানানের এই অনুমোদন এক ধরনের আরবিট্রারিনেস।

হাই প্রথমেই স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা চিহ্নিত করতে চান। এরপর তিনি সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা নিরূপণ করতে চান। তাঁর মতে আমাদের মূলধ্বনির চেয়ে বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা বেশি। আমাদের ভাষায় যেহেতু স্বরের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা নেই, হাই ‘ঈ” এবং ‘ঊ’ বর্জন করতে চান। সাধারণত যুগ্মস্বরের জন্য লিপি পাওয়া না যাওয়ায় হাই ‘ঐ’ এবং ‘ঔ’ বর্জনে আগ্রহী। এক্ষেত্রে বলা যায় বাংলায় যত যুগ্মস্বর আছে, সেগুলোর মাঝে ‘ঐ’ এবং ‘ঔ’ এর মত অত মসৃণ যুগ্মস্বর কি আর আছে? না থাকলে এ দুটোর জন্য বর্ণ রাখা যেতে পারে। হাইয়ের মতে বাংলা বর্ণমালা মূলধ্বনিভিত্তিক, সহধ্বনিভিত্তিক নয়। মূলধ্বনির অতিরিক্ত বর্ণ যা পাওয়া যায় প্রায় সবই ফেলে দেয়ার পক্ষপাতী হাই। যেমন, ণ-কে হাই পুরোপুরি বাদ দেয়ার পক্ষে। অন্যদিকে ‘ড়’ এবং ‘ঢ়’ এর ঐতিহ্য বজার রাখতে এ দুটোর জন্য তিনি পৃথক বর্ণ স্বীকার করেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে বাংলাভাষী তার কথায় ‘র’, ‘ড়’ এবং ‘ঢ়’ এর মাঝে কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য রক্ষা করে না, ফলে ‘ড়” এবং ‘ঢ়’ বাদ দেয়া যায়। হাই আগ্রহী নন কারণ ‘ড়’ এবং ‘ঢ়’ এর প্রতি তাঁর একধরনের প্রিয়তা রয়েছে। বাক্যের কনটেক্সটের দোহাই দিয়ে তিনি ‘শ’ রেখে ‘স’ এবং ‘ষ’ বাদ দিয়ে দিতে বলেন। কারণ, ‘ষ’ তো বাংলায় নেই, কনটেক্সট অনুযায়ী শ ধ্বনি স ধ্বনির মতই আচরণ করবে। কনটেক্সট বিচারে নিলে ত আরো বর্ণমালার অস্তিত্ব সংকট তৈরি হয়।

হাইয়ের একটি চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত এমন যে বর্ণের ক্ষেত্রে বাদ দিলেও বানানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বর্ণ তিনি সংরক্ষণ করতে চান। যেমন, ‘ঞ’-কে তিনি বর্ণমালায় রাখতে চান না,অথচ বানানরীতিতে রেখে দিতে চান। ‘ঋ’ বর্জন করতে চান অথচ বানানে ‘ঋ’ রাখতে চান। বানানরীতির ব্যাপারে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদণ্ডের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে আরো কিছু রীতি সংযোজনের প্রস্তাব দিয়েছেন। বিশেষ করে যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে মূল বর্ণের চেহারা তিনি অক্ষত রাখতে চান। বানানে তিনি ‘জ’ এবং ‘য’ ধ্বনির পার্থক্য সংরক্ষণে বিশ্বাসী। তাঁর প্রস্তাবিত বানানরীতির অনেক কিছুই বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরিতিতে গৃহীত। একথা বলতেই হয় যে, এ প্রবন্ধে হাই মানদণ্ডের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেননি। কোনো একটি বর্ণকে বর্ণমালা থেকে বাদ দিয়ে বানানে রাখতে চাওয়াই প্রিয় বর্ণের প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ। এ প্রবন্ধে হাইয়ের মানদন্ড অনেক বেশি বিক্ষিপ্ত। আসলে বানানরীতি যারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রণয়ন করতে চেয়েছেন, তাঁদের মোটামুটি প্রত্যেকেরই গবেষণার মানদন্ডে অসামঞ্জস্য ছিল। হাই সে রীতি ভাঙতে পারেননি।

৬. উপসংহার

হাইয়ের ভাষা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত তৎপরতাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করার একটা প্রবণতা আছে। এর বিপরীতে বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের রাজনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর তৎপরতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও হয়েছে। আমাদের মত এই যে, এ দুই ঘরানাই এ তথ্য এড়িয়ে যায় যে ভাষা সংক্রান্ত রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রস্তাব কেবল এবং কেবল ভাষাবৈজ্ঞানিক প্রকল্প দ্বারাই সম্ভব, যদি গবেষকের ভাষা ও সমাজ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান থাকে, যদি গবেষক হাইয়ের মত নির্মোহ হতে চান। হাইয়ের রচনা প্রমাণ করে যে ভাষা সমস্যার ভাষাতাত্ত্বিক চিকিৎসা দিতে গেলে রাজনৈতিক ভাষ্য যে তৈরি করতেই হবে এমন নয়। আমরা দেখেছি বাংলা ভাষা সংস্কার উদ্যোগের আগেপরের রাজনীতি নিয়ে হাই উদাসীন নন, তবে তাঁর ভাষাবৈজ্ঞানিক গবেষণাগারকে তিনি ভাষাবিজ্ঞান নিয়েই উত্তপ্ত রাখতে চান, উপস্থাপন করতে চান একান্তভাবেই ভাষাতাত্ত্বিক সমাধান। যে সমাধান হয়ত তাঁর ঐ গবেষণাগারের বহির্জগতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাটাতন হিসেবে কাজ করলেও করতে পারে। ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ে হাইয়ের মূল জিজ্ঞাসা ছিল বাংলা সাহিত্যের ভাষা কী হবে তা নিয়ে। তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন বাংলা ভাষা সংক্রান্ত যে সমস্যা তা আমাদেরই এবং লাভক্ষতি যা তাও আমাদের। অতএব, জাতীয় জীবনে অগ্রসর হতে গেলে আমাদের দরকার পড়বে আমাদের সাহিত্য। সে সাহিত্যের ভাষা বাংলা, লিপি বাংলা, তবে বিষয়বস্তু আমাদেরই পূর্ববঙ্গের দৈনন্দিক জীবন। সাহিত্যসাধনায় যদি পূর্ববঙ্গের জীবনের প্রাধান্য রচিত হতে হয়, সাহিত্যকে যদি আমাদের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার অনুগামী হতে হয় তবে এমন সাহিত্যিক দরকার ‘যে আছে মাটির কাছাকাছি’। আমাদের জীবনের সাথে যার প্রত্যক্ষ পরিচয়, আমাদের উপভাষার সম্পদ যিনি আহরণ করতে জানেন, আমাদের ভাষার ব্যবহারে যিনি সব্যসাচী। এমন লেখকের বিষয়বস্তু হতে পারে যে কোনো কিছুই, তবে তাকে আগে সাহিত্যের মানদন্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে, তা না হলে তিনি হবেন সাহিত্যিকের ছদ্মবেশে নিছক সংবাদ পরিবেশক। হাইয়ের সাথে আমরা একমত যে

সেজন্য কঠিন অধ্যবসায়ের দরকার, তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন-

‘এ পথের নিঃস্বার্থ সাধকের সাধনার প্রতি অভিসন্ধির আরোপ করা কিংবা দ্বন্দ্ব ও কলহের ভেতর দিয়ে তার সাক্ষাৎ মিলবে না।” (হাই, ১৯৯৪/৩, পৃ. ৪৫)

তথ্যনির্দেশ

আজম, মোহাম্মদ ২০১৮. *বাঙালি মুসলমানের পরিচয়ের রাজনীতি: মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তৎপরতার পর্যালোচনা.* সাহিত্য পত্রিকা (বর্ষ: ৫৬, সংখ্যা: ১), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আজাদ, হুমায়ুন ১৯৯৪. অবতরণিকা, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ১ম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হাই, মুহম্মদ আবদুল ১৯৯৪/১. *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ১ম খণ্ড.* হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হাই, মুহম্মদ আবদুল ১৯৯৪/২. *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ২য় খণ্ড.* হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হাই, মুহম্মদ আবদুল ১৯৯৪/৩. *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ৩য় খণ্ড.* হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা